Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-II, January 2023, Page No.31-38
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বাংলার নবজাগরণে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা

সুদীপ মুখার্জী
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
The new era of Bengal began in the 19th century. There was a big change in creation of life in every field. That is why, this age is known as the 'Dawn of a New Era'. British and East India Company had a great importance in abolishing the darkness in our country, as well as, Bengal's great scholars like Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, Madan Mohan Tarkalankar had significant role in doing the same. Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar is still in the core of our hearts, but the fame and identity of his childhood friend Madan Mohan tarkalankar has not been spread among us in that so extend. Yet Madan Mohan's active role in child education, women education, establishment of printing press and schools and colleges and also in the Literature was invaluable. So, it is rightly acceptable that Madan Mohan tarkalankar was one of the presentable figures in the plot of Bengal- Renaissance.

Key words: Bengal- Renaissance, Women Education, Child Education, Widow Marriage.

ভূমিকা: সুকুমার সেন ,অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, থেকে শুরু করে স্বপন বসু প্রায় সকল ভাষাবিদ, উনিশ শতকের গবেষক, ইতিহাসবিদ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন উনিশ শতক বাংলায় নতুন যুগ বা নবযুগের সূত্রপাত। বাংলার সর্বক্ষেত্রে জীবনদৃষ্টির পরিবর্তন - প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারাকে নাড়িয়ে দিয়ে এক চলমান নব যুগের সূত্রপাত - এগিয়ে চলার ইতিহাস তাইতো এই যুগ Dawn of a new Era নামেও পরিচিত। অনেকেই এই পরিবর্তনে ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকাল কে মনে করে থাকেন। একথা ঠিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রাজত্বকালে অবিভক্ত ভারত তথা বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতিতে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। আর এই অগ্রগতি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শুরু হয় এই বাংলায়। যদুনাথ সরকারের গলায় সেই সুর ধ্বনিত হয়। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে এক স্থিতিশীল জাতি ও এক গতিশীল জাতির মধ্যে হার পরাজয়ের মধ্যেই বঙ্গে আধুনিকতা সূত্রপাত হয়েছিল। (বাংলার নবচেতনার ইতিহাস, স্বপন বসু, পুস্তক বিপনী, পৃষ্ঠা ১)। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে জয়লাভ করে ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসনকার্য শুরু করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এক ঔপনিবেশিক নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাংলায় প্রচলিত হতে শুরু করল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার ক্ষেত্রগুপ্ত এর ভাষায় 'ইংরেজ-বিজয় থেকেই বঙ্গদেশ এবং

বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগ ডিঙিয়ে নব্যযুগে পা দিল। '(বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, ক্ষেত্রগুপ্ত, দ্বিতীয় খন্ড, গ্রন্থনিলয়, পৃষ্ঠা ২০৩)। শুধু ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার নয় ,বঙ্গদেশে ইংরেজি শিক্ষা ও সাহিত্যের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও বিলিতি পণ্যের নির্ভরশীলতা শুরু হলো। বাঙালিদের ইউরোপীয় সংস্কৃতি সাথে নবপরিচয় ঘটল। এদেশীয় বাঙালিদের চিন্তা -চেতনা কর্মে, চাল-চলনে, সৃষ্টিতে-দৃষ্টিতে, অভিনবত্ব সূচিত হলো। বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্যে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অচলায়তন ভেঙে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের নানা কর্মপ্রচেষ্টা ও শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে - 'দীনের মতো নয় রাজার মতো যাতে পশ্চিমী সংস্কৃতিকে অভ্যর্থনা করা যায় সেই জন্য প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সিন্দুক খুলে আমরা নিজেদের সাজিয়ে নিচ্ছিলাম।'* (ইতিহাস ও সংস্কৃতি - সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।)

পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুগামী অনুসারী হয়ে দেশীয় আদর্শে স্থিত এই দুই ধারার দ্বন্দ্বে বঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজ বিকাশ ঘটতে শুরু করলো। মানবতাবাদ, যুক্তিবাদ, ধর্মসংস্কার, জাতীয় ঐতিহ্য, স্বদেশ চেতনা ও ভাবনা এবং সাহিত্যের বিভিন্ন দিকের উদ্ভব-এগুলি কোথাও যেন নবজাগরণের বার্তাবাহী। হঠাৎ করে বঙ্গসমাজে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে গেল হটাৎ বাঙালি। দেব দেবীর মাহাত্ম্য থেকে বেরিয়ে মানবিকতা টান অনুভুত হল তাদের মনে।নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসার লাভ করল এই সময়। সমাজে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ দেখা দিল। যুক্তিবাদ ফিরে এলো অদৃষ্টবাদ কে বিসর্জন দিয়ে। তবে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে কিছু মহামানবের একই সময়ে বঙ্গে আগমনে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উনিশ শতকের বঙ্গদেশের নবজাগরণের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উয়িলিয়াম কেরি, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, লর্ড বেন্টিং প্রমুখরা ছিলেন অগ্রগণ্য, তেমনি বঙ্গদেশের মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে ভেঙে নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখাতে শুরু করেছিলেন বাংলায় একই দশকে জন্ম নেওয়া কিছু মনীষী বা মহামানব-তাঁদের নানান কর্মপ্রচেষ্টা, শিক্ষা ও সমাজ বিস্তারের মাধ্যমে। 'বাংলার নব চেতনার' ইতিহাস গ্রন্থে স্বপন বসু লিখেছেন - 'আধুনিকতার আলোকপাতে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার অচলায়তন কিছুটা নড়ে উঠল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষার দীপ জ্বালাবার জন্য কলকাতায় এলেন অক্লান্তকর্মী যুক্তিবাদী হেয়ার, শ্রীরামপুর মিশনারীরা এদেশের মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তাঁদের কর্মপ্রয়াসকে বহুমুখী করে তুললেন; প্রচুর বিত্তের অধিকারী বেদ-বাইবেল-কোরানে স্নাত রামমোহন এসে স্থায়ী বাসা বাঁধলেন কলকাতায়। 'জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োজনে স্থাপিত হলো 'স্কুল বুক সোসাইটি ' ১৮১৭ সালে। আর ওই একই বছরে বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলো 'হিন্দু কলেজ'। দেশীয় সাময়িক পত্রের আবির্ভাব নবচেতনার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুতির সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা হল। শুধু তাই নয় এদেশের অন্ধকারকে শিক্ষা ও সংস্কারের প্রদীপ জ্বেলে দূর করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন এমন কয়েকজন পন্ডিত ও মহামানব তারা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, স্বামী বিবেকানন্দ, মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ ব্যক্তিরা। বঙ্গের নবজাগরণের ধারক হিসেবে রাজা রামমোহন রায়ের নামটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এর উপযুক্ত বাহক ছিলেন দুই অভিন্ন হৃদয় বাল্য বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। উনবিংশ শতকের পর থেকেই বঙ্গের-শিক্ষা-সাহিত্য-সমাজ সর্বক্ষেত্রেই এইসব মনীষী ও পণ্ডিতরা তাঁদের বিভিন্ন সৃষ্টির -সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে, শিক্ষার ও সমাজ ভাবনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বিশ্ব দরবারে। আর এই ভাবেই বঙ্গদেশে নবযুগ বা নবপ্রভাতের সূত্রপাত।

প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য: মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে নানা প্রকার কুসংস্কার, কুপ্রথা, নানান ব্যভিচার, কুরীতি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। কোনভাবে দুধে-ভাতে থেকে বেঁচে থাকা বাঙালি তখন টপ্পা, কীর্তন, খিস্তি-খেউর, পাঁচালী, কবিগানে মত্ত থেকে জীবন কাটিয়ে দিত। গৌরিদান প্রথা, বশীকরণ প্রথা, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, দাস প্রথার প্রচলন ছিল সেইসময়। সমকালীন হিন্দুসমাজে কৌলিন্য প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। মধ্যযুগীয় বাঙালি জীবনকে একেবারে তছনছ করে তুলেছিল অকাল বৈধব্য কিংবা সতীদাহ প্রথার মতো নারী জীবনে অভিশাপ। সে যুগে নারীরা সামাজিক মর্যাদা থেকে অনেক দূরে ছিল। বাংলার শিক্ষাব্যবস্থার হাল ছিল অত্যন্ত করুণ। পাঠশালা, মাদ্রাসা, মক্তব, তোবাখানা, টোল, চতুষ্পাঠী থাকলেও সকলের ক্ষেত্রে পাঠ গ্রহণ সহজ ছিল না। পাঠশালা থাকলেও উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না। ভারতবর্ষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ইংরেজদের আগমনের সাথে সাথে পাশ্চাত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে নবপরিচয় ঘটলো।এই পাশ্চাত্য ভাবনা এদেশের কিছু মানুষের মনে নতুন করে যুক্তিবোধের জন্ম দিল। এই ধারণায় উজ্জীবিত হয়ে নতুন সমাজ গড়ার কাজে নেমে পড়লেন একই সময়ে বা একই দশকে জন্ম নেওয়া কিছু মহামনিষী ও পন্ডিত ব্যাক্তি। এই প্রসঙ্গে রামমোহন রায়ের নাম সর্বপ্রথম উঠে আসে। ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের রামমোহন রায় কলকাতায় নবজাগরণের উন্মেষ ঘটাতে পাকাপাকিভাবে বাস শুরু করলেন। এই নব্য বঙ্গের প্রথম বসন্তের ছোঁয়ার যাত্রা শুরু যদি হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তবে এই জয়যাত্রা ধারাকে এগিয়ে নিয়ে নিয়ে গেলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো কিছু গুণী পন্ডিত মানুষ। উনবিংশ শতকের বাংলায় শিক্ষা-সমাজ সংস্কার-দার্শনিক চিন্তাভাবনা, সাহিত্যসৃষ্টি, দেশপ্রেম সকল ক্ষেত্রেই আধুনিকতার নবযুগের সূত্রপাত ঘটলো। ঘটল নারী মুক্তি আন্দোলন। নারীদের শুধু সমাজের ভোগ্যবস্তু বা সেবাদাসী হিসেবে বিবেচিত না হয়ে নারীদের মানস মুক্তি ঘটলো। উনবিংশ শতকের আগে যে সকল সামাজিক ঘটনা ও কুসংস্কার বাঙালির সমাজ জীবনে সংঘাত এনেছিল সেগুলি আসতে আসতে অস্তমিত হতে শুরু করল। রামমোহন রায়ের যুক্তিনির্ভর মনের আকাঙ্খা,বঙ্গদেশে নবজাগরণের ভাবনা, দর্শন-সাহিত্য-সংস্কৃতির নব্য ব্যাখ্যা, সাধারণ মানুষের উচ্ছাস, ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, উইলিয়াম কলেজ ,শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা, বাংলার নব শক্তিকে প্লাবিত করতে শুরু করল। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার ডিরোজি ও বেথুন সাহেব প্রমুখ বাঙালি ও বিদেশি ব্যক্তিত্ব নতুন করে স্বপ্ন দেখার আকাঙ্ক্ষাকে জাগিয়ে তুললেন। সর্বক্ষেত্রে বাঙালিরা নবজীবনের আনন্দে মেতে উঠলো। সবুজপত্র প্রকাশে পর তাই বলা হয়েছে: 'দূর দেশের দখিন হাওয়ায় দেশান্তরে সাহিত্যকুঞ্জে ফুলের উৎসব জাগাইয়াছে, ইতিহাসে তাহার প্রমাণ আছে। 'উনিশ শতকের বাংলার সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজের সামাজিক উন্নয়নে,শিক্ষার সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে রাজা রামমোহন রায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নবজাগরণের অগ্রদূত। আর এই আলোকে প্রজ্বলিত করতে বঙ্গে অবতীর্ণ হলেন দুই পন্ডিত মনীষী- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। পরম বন্ধুত্বে, বিপ্লবে, বিচ্ছেদে, বিতর্কে একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজোড়া নাম। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র মানুষের কাছে ঈশ্বর হয়ে মনের মণিকোঠায় থাকলেও বন্ধু মদনমোহনের মোহন বাঁশি মানুষের কাছে আজও সঠিকভাবে পৌঁছায়নি। অথচ শিশুশিক্ষা, নারীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ প্রচলন, স্কুল কলেজ, প্রতিষ্ঠা, প্রেস স্থাপন, নানা সামাজিক প্রেক্ষাপটে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা ছিল অনবদ্য। তাই নবজাগরণের প্রেক্ষাপটে মদনমোহনের প্রাসঙ্গিকতা উত্থাপন খুবই যুক্তিযুক্ত।

গবেষণার উদ্দেশ্য: গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো বঙ্গের নবজাগরণে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

গবেষণার পদ্ধতি: বর্তমান গবেষণাপত্রটির গুণগত গবেষণা পদ্ধতি বা Qualitative Research হিসেবে পরিচালিত। ঐতিহাসিক গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে এই গবেষণা সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস ও গৌণ উৎসের সমন্বয়ে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মাধ্যমে আলোচনা-পর্যালোচনা দ্বারা গবেষণার ফলাফল বিচার করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল: মদনমোহন তর্কালঙ্কার উনিশ শতকের বঙ্গদেশে বাংলা তথা বাঙালির আলোকপ্রাপ্তির প্রাণপুরুষ। কিন্তু এমন বহুমুখী সহজাত প্রতিভা, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারক, স্ত্রী শিক্ষার প্রচারক শিশুশিক্ষার প্রণেতা, এই মহাপুরুষের বাংলার নবজাগরণের ভূমিকা ও প্রাসঙ্গিকতা আলোচনার বিষয়।

কলকাতায় আগমন: উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত ছিল কলকাতা। নতুন যুগের নতুন শহর হিসেবে কলকাতা আত্মপ্রকাশ করলো। যদিও তখন স্থান হিসেবে কলকাতা মোটেই স্বাস্থ্যকর ছিল না। তবুও উনিশ শতকের বাণিজ্য কেন্দ্র ও শিক্ষা কেন্দ্র রূপে কলকাতা বিকশিত হতে শুরু করলো। নানা রকম মানুষ এসে ভিড় জমালো কলকাতায়। কিন্তু কিভাবে হলো মদনমোহন ও কলকাতার যোগ। ১৮১৭ সালের ৩রা জানুয়ারি নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী মদনমোহন তর্কালঙ্কার শৈশবে প্রাথমিক শিক্ষার শুরু করেছিলেন ঠিকই কিন্তু তাঁর বয়স যখন ১২ বছর তখন কাকা রামরতন চট্টোপাধ্যায় (সংস্কৃত কলেজ এর লিপিকর) তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করে দিলেন। ঠিক সেই সময়ই সংস্কৃত কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রেরও আবির্ভাব মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রাম থেকে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। শুরু হল দুজনের সংস্কৃত কলেজে পাঠগ্রহণ পর্ব। ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহনের এই প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে সংস্কৃত কলেজে পাঠ ও শিক্ষা গ্রহণ এ যেন ক্ষুদ্রতম গণ্ডি ছেড়ে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশের যাত্রা- নবজাগরণের ইঙ্গিতবাহী। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ তাঁদের দুজনের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন- 'তর্কালঙ্কার ও বিদ্যাসাগর এক শ্রেণীতে ব্যাকরন অধ্যায়ন করিতে লাগিলেন। উদারচিত্ত ও অসাধারণ প্রতিভায় উভয়েই কেহ কাহারও ণ্যূন ছিলেন না। প্রথম পুরস্কার ইঁহাদিগের দুইজন ব্যতীত অপর কেহ পাইতে পরিত না।

কিন্তু কিসের সন্ধানে মদনমোহন , ঈশ্বরচন্দ্র এসেছিলেন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। সংস্কৃত ভাষার সেরা শিক্ষাটি তাঁরা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ওই বয়সেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ভারতের এই ভাষাটি না শিখলে ভারতীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। শুধু তাই নয় সেইযুগে মদনমোহনের পিতা রামধন চট্টোপাধ্যায় ও কাকা রামরতন চট্টোপাধ্যায় নদীয়ার ওই অখ্যাত গ্রামের নিবাসী হয়েও সংস্কৃত কলেজের লিপিকর ছিলেন। এই সংস্কৃত কলেজ থেকে মদনমোহন ব্যাকরণ শিক্ষা, সাহিত্য শিক্ষা, অলঙ্কারশাস্ত্র, বেদান্ত শিক্ষা, আইন শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। শুধু তাই নয় মদনমোহনের কর্মজীবনের অনেকটা কেটেছে এই কলকাতায়। ১৮৪৩ সালের এপ্রিল মাসে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পন্ডিত হিসেবে পদ গ্রহণ করেন। শুধু বাঙালি ছাত্ররা নয় ইংরেজ সিভিলিয়ানরাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখতেন। আবার ১৮৪৬ সালের ১৩ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের আকস্মিক মৃত্যুতে মদনমোহন সেই পদ অলংকৃত করেন। তাঁর ইচ্ছেপূরণ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র এর

মতোই সংস্কৃত কলেজে পড়বার ও পড়াবার সুযোগ মদনমোহন পেয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজের এই মেধাবী ছাত্রটি খুব ছোটবেলা থেকেই কাব্য, কবিতা লেখা শুরু করেন। মধ্যযুগের শেষ কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে তিনি তাঁর কাব্যগুরু হিসেবে অনুসরণ করেন। তাঁর কাব্য আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে খুব অল্প বয়সে লেখেন রসতরঙ্গিনী (১৮৩৪) এবং বাসকদত্তা (১৮৩৬) মতো কাব্য। অসাধারণ কাব্য প্রতিভা তাকে এনে দিয়েছিল তর্কালঙ্কার উপাধি। ১৮৫০ সাল পর্যন্ত কলকাতায় থাকার সুবাদে ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন একসাথে একহয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা পথ হেঁটেছেন। দুজনে তাঁরা একে অপরের পরিপূরক, পৃষ্ঠপোষক এবং অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। কেউ কখনো কোনো ভাবেই নিজের প্রভাব ও প্রভাস থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এক প্রাণ এক হৃদয় হয়ে, নতুন আশা নিয়ে শিক্ষা ও সমাজের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। মদনমোহন যে কয়েক বছর কলকাতায় ছিলেন ততদিন তাঁর শিক্ষা, অধ্যাপনা, সাহিত্যজীবন ও সমাজ সংস্কারের স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

সংস্কৃত প্রেস নির্মাণ: ১৮৪৭ সালের পর থেকে কলকাতা ও কলকাতার আশেপাশে বহু ছাপাখানা বা প্রেস প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করল। কলকাতা, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি নানা জায়গায় প্রায় পঞ্চাশের বেশি ছাপাখানা তৈরি হলো। (বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস- বরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়)। বঙ্গের নবজাগরণের ক্ষেত্রে এই প্রেস বা ছাপাখানার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহন দুজনেই ছিলেন নবযুগের। তাঁদের উপলব্ধি, তাঁদের চিন্তা, ভাবনা সমাজের কাছে ছড়িয়ে দিতেই তাঁরাও ছাপাখানা তৈরীর পরিকল্পনা নিলেন। এই পরিকল্পনার প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন অবশ্যই মদনমোহন তর্কালঙ্কার। একটি ছাপাখানা কিনে নেওয়ার মতো সামর্থ্য কিন্তু দুজনের মধ্যে কারো ছিল না। তখন তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে গেলেন এবং ধার চাইলেন। ধার পেয়ে প্রেসের প্রয়োজনীয় উপকরণ কেনা হলো। প্রেসের নামকরণ করা হলো – 'সংস্কৃত যন্ত্র'। মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র দুজনেই ছিলেন ওই সংস্কৃত যন্ত্র ছাপাখানার সমঅংশভোগী। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজেও সেকথা স্বীকার করে বলেছেন:-

> 'যৎকালে আমি ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত ছিলাম; তর্কালঙ্কারের উদ্যোগে সংস্কৃত যন্ত্র নামে একটি ছাপাখানা সংস্থাপিত হয়। ঐ ছাপাখানায় তিনি ও আমি সমাংশভাগী ছিলাম।
>
> (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস, পৃষ্ঠা ৫)

'অন্নদামঙ্গল' কাব্য হলো সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস এর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এই প্রেস স্থাপনের মধ্য দিয়েই দুই বন্ধুর সম্পর্ক আরো মধুর হলো। সংস্কৃত যন্ত্র প্রেস থেকে মুদ্রিত গ্রন্থ, অনুবাদ গ্রন্থ, অন্যরকম নানা গ্রন্থ ছাপার শুরু হলো। তাই সংস্কৃত প্রেস নবজাগরণের নব দিগন্ত রূপে দেখা দিল।

নারীশিক্ষা: নারী শিক্ষার ব্যাপারে বঙ্গসমাজে রক্ষণশীল মানুষেরা সেভাবে আগ্রহ দেখায়নি। লেখাপড়া শেখাকে তারা অপয়া বলে গণ্য করতো। এমনকি বলা হতো যে মেয়েরা লেখাপড়া করলে অচিরেই তারা বিধবা হবে। সমাজের ঢেলে দেওয়া হয়েছিল আজব সব বিষ।আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ভয় পেয়েছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাদের সমকক্ষ হয়ে উঠবে। লেখাপড়া করে নারীরা সমাজে প্রবেশ করলে হয়তো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ঘুন ধরবে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং বঙ্গদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার চল শুরু হলেও নারী শিক্ষার বিষয়টি তখনও ছিল অন্ধকারে। কিন্তু এই

সমাজের কিছু আলোকপ্রাপ্ত যুবক নারী শিক্ষা প্রচলনের গুরুত্বের কথা অনুভব করলেন। ঠিক এই সময়ে নারী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে সবথেকে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠলেন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা সচিব এলিয়েন বেথুন সাহেব। তাঁর উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফল হিসেবে ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হল। বর্তমানে এই স্কুল বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। মহিলা স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে কয়েকজন পন্ডিতের সাহায্য তিনি পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদনমোহন তর্কালঙ্কার , বিদ্যাসাগর প্রমুখ। এই সকল মহান মনীষীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা ,অনুরাগের ফলে বঙ্গ বালিকাদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য স্কুল খোলা শুরু হল।নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে এক নতুন দিগন্তের সূচনা। বাল্যবন্ধু বিদ্যাসাগর ও বেথুন সাহেবের অনুরোধে পণ্ডিত মদনমোহন বালিকাদের উপযোগী শিশুপাঠ্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন 'শিশুশিক্ষা' নামে ৩টি খণ্ডে। শিশুশিক্ষার আখ্যান পত্র দেখলে বোঝা যায় বইগুলি বালিকা ও শিশুদের জন্য রচিত।বেথুন বালিকাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় সমাজকে উপেক্ষা করে তাঁর পাশে ছিলেন মদনমোহন। শুধু তাই নয় তাঁর দুই মেয়েকে ভুবনমালা ও কুন্দমালা কে বেথুনের স্কুলে ভর্তি করেছেন, বিনা বেতনে পাঠদান করেছেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় বঙ্গদেশের অনেক প্রভাবশালী ব্যাক্তিরা এই বিষয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। মদনমোহন শুধু নারী শিক্ষা সমর্থক ও উদ্যোগী ছিলেন তা নয়, তাদের প্রগতির কথা ভেবে লেখাপড়ার পাশাপাশি স্বনির্ভর হওয়ার কথা বলেছেন। মদনমোহন তাঁর 'স্ত্রী শিক্ষা' প্রবন্ধে বলেছেন –

> "অন্তপুরে বসিয়া নানাবিধ শিল্পকার্য ও কারুকর্ম নির্মাণ করিবে তদ্বারা অনায়াসে অভিলাষিত অর্থেরও অধিগম হইতে পারিবে।"

তিনি আশা করেছিলেন যেদিন মেয়েরা বিদ্যার আসল মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে সেদিন দামী বসন-ভূষণ কে পরম পদার্থ বলে গন্য করবে না। তাঁর এই ভবিষ্যৎবানী এখন সত্যে পরিণত হয়েছে। বঙ্গনারী আজ বিভিন্ন রূপে মর্যাদার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী।

শিশুশিক্ষা: প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করে দেখা যায় এই দুই যুগে শিশুর হাতেখড়ি হত পাঠশালায় কিংবা গুরুগৃহে গুরুমশাইদের মুখে নামতা শিক্ষা, চৌতিশা ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে। উনিশ শতকের সূচনাতে বাঙালী তাদের ভাবধারা থেকে একটুও সরে আসেনি। কিন্তু এই ভাবধারার পরিবর্তন আনলেন মিশনারীরা। উনিশ শতকের গোড়া থেকে মিশনারীরা পাশ্চাত্য শিক্ষার আদর্শে স্কুল কলেজ স্থাপন করতে শুরু করলেন। বিস্ময়ের ব্যাপার শিশুপাঠ্য গ্রন্থের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম বাংলা প্রাইমার রচনায় এগিয়ে এলেন শ্রীরামপুর মিশনারীরা ১৮১৬ খ্রীঃ ১২ পাতার একটি প্রাইমার রচনার মাধ্যমে। ১৮১৮ সালে স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে স্টুয়ার্ট স্কুলপাঠ্য বাঙালী বর্ণমালা শিক্ষার উদ্দেশ্য লিখলেন বর্ণমালা। এরপর বাঙালীরা শিশুপাঠ্য ও শিশুশিক্ষার বিভিন্ন গ্রন্থ লেখার পথ চলা শুরু করলেন। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ঈশ্বর চন্দ্র বসু 'শব্দসার' নামে লিখলেন একটি বর্ণশিক্ষার বই। তারপর দুটি খণ্ডে রচিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ শিশুদের বর্ণশিক্ষার জন্য লিখলেন নতুন প্রাইমার 'শিশুসেবধি' (১৮৪০)। উনিশ শতকের বাংলা প্রাইমারের ক্ষেত্রে ভোরের আলো দেখা গেল সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহপাঠী, পরম বন্ধু, সহকর্মী মদনমোহন তর্কালঙ্কার-এর হাত ধরে। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের বর্ণশিক্ষা, দ্রুতপঠনের জন্য মদনমোহন লিখলেন বাংলা সাহিত্যের একটি অন্যতম প্রাইমার 'শিশুশিক্ষা' ৩টি ভাগে (১৮৪৯, ১৮৫০, ১৮৫০)। ১৮৪৯ সাল যদি বাংলা প্রাইমারের পালাবদলের সূচনা হয় ১৮৫৫ সাল হল বাংলা প্রাইমারের নতুন মাইলস্টোন।বাঙালীর শিশুদের কাছে প্রাইমার কেমন হওয়া উচিত তা প্রথম দেখালেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার। আর সেই পথকে আরও সুদৃঢ় করলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর – বাংলা প্রাইমারকে সাবালকত্ব

দান করে। যদিও শিশুশিক্ষা হল কাব্যধর্মী প্রাইমার, অন্যদিকে বর্ণপরিচয় হল গদ্যে রচিত প্রাইমার।মদনমোহন তর্কালঙ্কার যখন তাঁর শিশুশিক্ষা রচনা করছেন তখন তাঁর সামনে সফল প্রাইমার ছিল না, কিন্তু বিদ্যাসাগর যখন তাঁর বর্ণপরিচয় রচনা করছেন তখন তাঁর হাতে শিশুশিক্ষার মতো জনপ্রিয় প্রাইমার। তাঁর এই গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে রয়েছে মূল্যবোধ শিক্ষা ও শান্তি শিক্ষার বাণী। মদনমোহন চেয়েছেন শিশুরা কুসংস্কার মুক্ত মন নিয়ে বড় হোক, অবাস্তবিক বিষয়কে পরিহার করুক।

প্রশাসক ও সমাজ সংস্কারক: মদনমোহনের কর্মজীবনের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাওয়া যায় ১৮৪১ সালের ছাত্র জীবন শেষ করার পর ১৮৪২ সালেই তিনি হিন্দু কলেজ পাঠশালার বাংলার শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তারপর একে একে বারাসাত ইংরেজি পাঠশালার প্রধান শিক্ষক, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও কৃষ্ণনগর গভমেন্ট কলেজ এর পন্ডিত পদ অলঙ্কৃত করেন। পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। এর পর মদনমোহন মুর্শিদাবাদ জেলার জজ পন্ডিত এবং সবশেষে কান্দি মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ অলঙ্কৃত করেন বিটন সাহেবের স্কুল প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিটন সাহেবের উপযোগী সহযোগী। কোনরূপ বেতন না নিয়ে তিনি পড়াতেন। স্ত্রী শিক্ষার বৈধতা নিয়ে প্রখর যুক্তি তরঙ্গে বিরোধী বক্তব্য খন্ডন করে লেখেন স্ত্রী শিক্ষা নামক প্রবন্ধ। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে সাথে সাথে তিনি মুর্শিদাবাদে থাকাকালীন বিধবা বিবাহের ব্যাপারেও দুটি কাজ করেছিলেন। এক বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রমাণের জন্য বইপত্র লিখলেন এবং তার জন্য গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করলেন। দ্বিতীয় বিধবা আইন পাশের পর পাত্র-পাত্রী সন্ধান শুরু করলেন। বিধবা বিবাহের মত প্রবল বিতর্কিত বিষয়টিকে আইনসিদ্ধ ভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও মদনমোহনের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। প্রথম বিধবা পরিণিতা হলেন শ্রীশ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার তাঁরই স্নেহধন্য। তিনি বিবাহ করেন কালীমাতা দেবীকে, তিনিও মদনমোহনের পরিচিতা। আর এই প্রথম বিধবা বিবাহের মধ্যস্থতা করলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার নিজে। ড. সৌমেন্দ্রনাথ নন্দী লিখেছেন ১৮৫০ সালের পুলিনবিহারী সেনের সহযোগিতায় মদনমোহন বহরমপুর ক্যান্টনমেন্টে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় বিষয়ে একটি মোক্ষম রোপোর্ট পেশ করেছিলেন। এর সঙ্গে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার দাবিও জুড়ে দেন। মদনমোহন যে রিপোর্ট পেশ করেন তার সক্রিয় তৎপরতায় তিন বছর পর কলেজের ভিত্তি প্রস্তরের কাজ শুরু হয়। শুধু উদ্যোগ নিয়ে তিনি কাজ শেষ করেননি,ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক সাহায্য করেছেন। এর ফলেই প্রতিষ্ঠা হল বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ। জীবনীকার জামাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ পরিবেশিত তথ্য অনুসারে মুর্শিদাবাদে মদনমোহন একটি বালিকা বিদ্যালয়, একটি ইংরেজি বিদ্যালয়, একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, বাল্য বিধবাদের জন্য একটি দাতব্য সভা, একটি অতিথি নিবাস এবং একটি অনাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ে যা সত্যি নবজাগরণের অর্থবাহি।

মন্তব্য: বাংলার তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসান ঘটিয়ে উনিশ শতকের উনিশ শতকের অগ্রসর চেতনা কে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যারা তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার মধ্য গগনে সূর্য উঠতে না উঠতেই খুব অল্প বয়সেই তার প্রতিভার সূর্য অস্তমিত হলেও তার অনন্য সাধারণ কর্মকান্ড যথার্থ মর্যাদা ও স্বীকৃতি আজও দেয়নি বাংলা। তার সাহিত্য সমাজ ভাবনা ও নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসেবে যথার্থ চর্চা ও স্বীকৃতির খুবই প্রয়োজন। স্কুল পাঠ্যে শিশুশিক্ষা শিশুদের কাছে পাঠ্য বিষয় হিসেবে বিবেচিত হওয়াটা খুবই দরকারি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার একজন সমাজ মনস্ক, শিক্ষিত, শিক্ষাব্রতী, স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সংবেদনশীল ,সমাজ সংস্কারক ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আজ মদনমোহন শুধু

জীবিত জনমানষে 'প্রভাত বর্ণনে'র কবি হিসেবে। মদনমোহন সম্পর্কে অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য বলেছিলেন:-

> "তিনি (মদনমোহন) যদি ডেপুটিগিরি চাকরি করিতে না গিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যসেবায় রত থাকিতেন তাহা হইলে এক্ষণে আমরা যে প্রশংসা পুষ্পাঞ্জলী কেবল বিদ্যাসাগরের চরণে অর্পণ করিতেছি তাহা অর্ধেক ভাগ করিয়া দুইজনকে দিতে হইত।"

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১. বসু, স্বপন। (১৯৯৩) । সমকালে বিদ্যাসাগর। কলকাতা।
২. দাশ, নির্মল (২০০৮) । মদনমোহন তর্কালঙ্কার স্মারক গ্রন্থ। পারুল প্রকাশনী, কলকাতা-০৯।
৩. খাস্তগীর, আশিস (২০০৯) । বাংলা প্রাইমার সংগ্রহ। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। কলকাতা।
৪. রীত, প্রত্যুষ কুমার (২০১৩) । মদনমোহন তর্কালঙ্কার। দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা।
৫. শাস্ত্রী, শিবনাথ (২০১৬) । রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। মাইতি বুক হাউস। কলকাতা।
৬. ভট্টাচার্য, প্রীতম (২০১৭) । দ্বিশতবর্ষে মদনমোহন তর্কালঙ্কার। সাহিত্যম।